ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স (২য় ব্যাচ)
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত ১ম ক্লাস, ১০/১/২৪ বুধবার

ভূমিকা:

সীরাতুর রাসূল (ছা:) জানার গুরুত্ব:

মুসলিম হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান আমাদের অর্জন করতেই হবে। এটা ফরয। আর কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হল সীরাতুর রাসূল (ছা:)। কেননা তাঁর জীবনী হল এই দুটির বাস্তব রূপ। কুরআন ও হাদীছ আমরা কিভাবে মেনে চলব তা রাসূল (ছা:) তাঁর জীবনে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন। মা আয়েশা (রা:) বলেন, কানা খুলুকুহু আল-কুরআন।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা আমাদের উপর ফরয। আর কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব রূপ আমাদের রাসূলের জীবনী। সুতরাং তা জানা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের প্রায় ৪০টি জায়গায় তাঁর রাসূলের অনুসরণের কথা বলেছেন। সেই রাসূলের জীবনী জানতেই হবে।

নবী মুহাম্মাদ (ছা:) এর জীবনী মানে আদম (আ:) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বোত্তম মহামানবের জীবনী। সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূলের জীবনী। যাকে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। "নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী"।

মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা হিসাবে এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনে সর্বযুগের সর্বোত্তম আদর্শ আমরা আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আদর্শ হিসাবে পেতে চাই। ইহকালে তিনিই আমাদের অনুসরণীয় এবং পরকালে তিনিই আমাদের শাফা'আতকারী। সুতরাং তাঁর জীবনী জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ।

কেউ যদি আদর্শ মানুষ অথবা পিতা অথবা স্বামী অথবা অভিভাবক অথবা রাষ্ট্র নায়ক অথবা সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, নেতা... হতে চায়, তাহলে তার জন্য রাসূলের জীবনী জানা ও মানা আবশ্যক। কিন্ত দু:খজনক হলেও সত্য মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেক শিক্ষিত লোকই আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীর জীবনী সম্পর্কে জানে না। এমনকি তাঁর পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর নামটুকুও জানে না। তাঁর জন্ম কোথায়, কোন বংশে এবং তাঁর মৃত্যু কোথায়, কবর কোথায় তাও অনেকে জানে না। মুসলিম হয়েও তার পছন্দনীয় রাজনৈতিক নেতার নাম, তার চৌদ্দ গোষ্ঠির নাম, জন্ম-মৃত্যু সহ সব জানে। প্রিয় খেলোয়ারের নাম, কোন খেলায় কত রান বা গোল করেছে, কোন নায়ক-নায়িকা, গায়ক গায়িকা সম্পর্কে সবই জানে! কেবলই জানে না আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল মহামানব মুহাম্মাদ (ছা:) সম্পর্কে! তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে! জি, এটাই অতীব দু:খজনক বাস্তবতা!

আবার যারা তাঁর সম্পর্কে জানে ও মানে তাদের অনেকেই ভুলভাবে জানে ও মানে। কোন কোন গোষ্ঠী তাকে নূর নবী বানিয়েছে, কেউবা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। তাকে অনুরসণীয় না বানিয়ে পূজনীয় বানিয়েছে। এসবই গোমরাহি। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ (ছা:) এর বিশুদ্ধ জীবনী জানা আবশ্যক।

তাই যেই নবী আমাদের সার্বিক জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ, যার আনিত বিধান আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়, যিনি আমাদের আখিরাতের শাফা'আতকারী, যার আনিত বিধান ছাড়া বাকী সমস্ত বিধান রহিত, যার আনিত ইসলাম ছাড়া সমস্ত দ্বীন বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য; সেই নবীর জীবনী জানা আমাদের আবশ্যক।

সীরাত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

আরবরা ছিল প্রখর ধীশক্তি সম্পনড়ব। সবই তারা মুখস্ড় বলত। লেখাকে তারা হীন কাজ মনে করত। সেকারণ পবিত্র কুরআন, কিছু হাদীছ ও ইলমে নাহুর মূলনীতি সমূহ ব্যতীত রাসূলুল াহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় কোন জীবন চরিত লিপিবদ্ধ হয়নি। পরে অনারবদের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপটে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হি./৬৬১-৮০ খৃ.) এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি ইয়ামনের ছান'আ থেকে আবীদ বিন শারিইয়াহ জুরহুমীকে ডেকে আনেন ও তাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেন। তিনি তাঁর জন্য (বাদশাহদের ও বিগতদের ইতিহাস) রচনা করেন। অতঃপর একাধিক বিদ্বান রাসূলুল াহ (ছাঃ)-এর জীবনচরিত লেখার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

ছাহাবীগণ:

কুরআন ও হাদীছের মূল উৎস দ্বয়ের পর ছাহাবীগণ হ'লেন সীরাতুর রাসূলের প্রধান উৎস। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন ও কর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁদের বর্ণনাসমূহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। এরপরেও জীবন চরিত বিষয়ে তিনজন ছাহাবী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তারা হ'লেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ এবং বারা বিন 'আযেব আনছারী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)।

তাবেঈগণ: অতঃপর তাবেঈগণের মধ্যে ওরওয়া বিন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (মৃ. ৯২ বা ৯৪ হি.)। আয়েশা (রাঃ) ছিলেন যার আপন খালা। তাঁর পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই প্রখ্যাত ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) এবং মা ছিলেন আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)। ফলে তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরের ও বাইরের বিভিন্ন বিষয় জানা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনা করা। বলা চলে যে, প্রথম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৮৫-১৫১ হি.) তাঁর থেকেই বেশী তথ্য নিয়েছেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মুক্তদাস ইকরিমা (মৃ. ১০৫)। যার সম্পর্কে ত্বাহাভী (২৩৯-৩২১ হি.) বলেন, ইকরিমা ও যুহরীর উপরেই মাগাযীর অধিকাংশ বর্ণনা আবর্তিত হয়'।

অতঃপর 'আমের বিন শারাহীল আশ-শা'বী (২২-১০৪ হি.), আবান বিন ওছমান বিন 'আফফান (মৃ. ১০১ বা ১০৫), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ইয়ামানী (মৃ. ১১০), 'আছেম বিন ওমর বিন ক্বাতাদাহ (মৃ.

১১৯), মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪)। যাঁরা ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রম সিকিতে এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাবে-তাবেঈগণ :

(১) ইবনু শিহাব যুহরীর ছাত্র মূসা বিন ওক্ববা (মৃ. ১৪০ হি.) রচিত 'মাগাযী' গ্রন্থকে ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহঃ) 'বিশুদ্ধতম' বলেছেন।

(২) সুলায়মান বিন তুরখান আত-তায়মী (মৃ. ১৪৩) 'বিশুদ্ধ জীবনী' নামে একটি জীবনী লেখেন।

(৩) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মাদানী (৮৫-১৫১), যিনি ইবনু শিহাব যুহরীর ছাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক ঘটনাবলী বর্ণনার নেতা বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা সমূহ 'বিশুদ্ধ' স্তরে পৌঁছতে পারেনি। তাঁর সীরাত গ্রন্থটিতে 'হাসান' ও যঈফ বর্ণনাসমূহ একত্রিত হয়েছে। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, ইবনু ইসহাক হলেন 'মাগাযী শাস্ত্রের দলীল'। কিন্তু সেখানে অনেক 'অজানা ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ' রয়েছে।

পরবর্তী জীবনীকারগণঃ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনু হিশাম বাছরী (মৃ.২১৩ অথবা ২১৮ হি.)। তাঁর রচিত

'আস-সীরাতুন নববিইয়াহ' গ্রন্থটি 'সীরাতু ইবনে হিশাম' নামে পরিচিত। ইনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের পরিমার্জন ও পরিশোধন করেন। সেখান থেকে ইস্রাঈলী বর্ণনাসমূহ এবং অপ্রয়োজনীয় কবিতাসমূহ দূর করে দেন। তিনি সেখানে ভাষাগত ও বংশ তালিকা বিষয়ে তথ্যসমূহ সংযোজন করেন। এভাবে তিনি কিতাবটিকে এমনভাবে রূপ দেন, যা ছহীহ হাদীছের বর্ণনা সমূহের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ফলে তা বিদ্বানগণের সন্তুষ্টি লাভ করে এবং পরবর্তীতে রচিত সকল সীরাত গ্রন্থের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। সেজন্য বলা হয়, 'তাঁর পরে এমন কোন জীবনীকার নেই, যিনি তাঁর মুখাপেক্ষী হননি' (সীরাহ ছহীহাহ ১/৬৬ পৃঃ)।

এছাড়াও যুগে যুগে আরোও অনেক বিদ্বান সীরাতুর রাসূল (ছা:) বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন।

নবী চরিতের হেফাযত :

আল্লাহ যেমন কুরআন ও হাদীছকে হেফাযত করেছেন, তেমনি তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবন চরিতকেও স্বীয় অনুগ্রহে হেফাযত করেছেন। ফলে যুগে যুগে বিভিনড়ব আল্লাহভীরু চরিতকারগণের মাধ্যমে বিশেষিত হয়ে তাঁর বিশুদ্ধ জীবনচরিত মানবজাতির সামনে এসেছে। কেননা যাকে আল্লাহ তাঁর অহী নাযিলের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনচরিত হবে মানবজাতির জন্য আদর্শ জীবনমুকুর। যার স্বচ্ছ আলোকধারা অন্যের জীবনের অন্ধকার দূর করবে। যঈফ, জাল ও বানোয়াট কাহিনী থেকে মুক্ত করার মাধ্যমেই তাঁর বিশুদ্ধ জীবনচরিত মানুষের নিকট উদ্ভাসিত হবে।

প্রথম যুগের মুহাদ্দিছগণ হাদীছের ছহীহ-যঈফ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যেভাবে কঠোর নীতিমালা তৈরী করে 'রিজাল শাস্ত্র' প্রণয়ন করেছেন। জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন শাস্ত্র রচিত হয়নি। সাথে সাথে ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ থেকে তাওহীদের আক্বীদাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে প্রথম যুগের বিদ্বানগণ যত বেশী মনোযোগী ছিলেন, জীবন

চরিতের ব্যাপারে অতটা মনোযোগী ছিলেন না। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুষ্টু পন্ডিতেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনচরিতে কলংক লেপনের অপচেষ্টা করেছে। সেজন্যেই দেখা যায়, কোন কোন প্রাচ্যবিদ

সীরাতে ইবনে হিশামের চাইতে ওয়াক্বেদীর মাগাযীকে অগ্রাধিকার দেন। অথচ সেটি মুহাদ্দিছগণের নিকট পরিত্যক্ত ও যঈফ।

হাদীছগ্রন্থ ও সীরাতগ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সীরাত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ বর্ণনার সনদ মুরসাল ও মুনক্বাতি' বা ছিন্নসূত্র।

এক্ষণে যদি আমরা হাদীছগ্রন্থের ন্যায় সীরাতগ্রন্থ সমূহে 'ছহীহ' বর্ণনা সমূহকে অগ্রাধিকার দেই এবং হাদীছের সমালোচনার ন্যায় সীরাতের বর্ণনা সমূহের সমালোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহ'লে সীরাতগ্রন্থগুলি হাদীছ গ্রন্থসমূহের ন্যায় নিষ্কলংক হয়ে উঠবে। দেরীতে হলেও এযুগের বিদ্বানগণ সেদিকে পা বাড়িয়েছেন। যা বিগত বিদ্বানগণের জন্য অসম্ভব ছিল।

আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে বর্তমান শতাব্দীতে শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃঃ), ড. আকরাম যিয়া উমারী (জন্ম : ইরাক ১৯৪২ খৃঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-উশান (রিয়াদ) প্রমুখ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) এর উৎসঃ ক) কুরআন কারীম খ) হাদীছ গ) ছাহাবীগণ ঘ) তাবেঈগণ ঙ) তাবে তাবেঈগণ চ) দালায়েলুল নুবুওয়াত ও শামায়েল কিতাবসমূহ, তাফসীর, সিয়ার, মাগাযী, তারিখ, ত্বাবাক্বাত, তারাজিম ও ফিকহের কিতাবসমূহ ইত্যাদি।

আরব জাতিঃ

মধ্যপ্রাচ্যের মূল অধিবাসী হ'লেন আরব জাতি। সেকারণ একে আরব উপদ্বীপ বলা হয়। আরবরা মূলতঃ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ১. আদি আরব যারা আদ, ছামূদ, আমালেক্বা প্রভৃতি আদি বংশের লোক। ২. ক্বাহত্বানী আরব। যারা ইয়ামনের অধিবাসী। ৩. 'আদনানী আরব। এরা ইবরাহীম-পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত 'আদনান-এর বংশধর। এদের বংশেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়।

নবুঅতের কেন্দ্রভূমিঃ

আদি পিতা আদম, নূহ, ইদ্রীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, শু'আয়েব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা ('আলাইহিমুস সালাম) এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সহ সকল নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও কর্মস্থল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের এই পবিত্র ভূখন্ড।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ

আরবভূমি মরুবেষ্টিত হওয়ায় তা সর্বদা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। ফলে এরা জন্মগতভাবে স্বাধীন ছিল। এই সময় আরবের দক্ষিণাংশে ছিল হাবশার সাম্রাজ্য, পূর্বাংশে ছিল পারসিক সাম্রাজ্য এবং উত্তরাংশের ভূখন্ডসমূহ ছিল রোমক সাম্রাজ্যেও করতলগত। সম্রাট শাসিত এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা সবাই ছিল ধর্মের দিক দিয়ে খ্রিষ্টান। যদিও প্রকৃত ধর্ম বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। মক্কা ও ইয়াছরিব (মদীনা) সহ আরবের বাকী ভূখন্ডের লোকেরা স্বাধীন ছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবে তারা গোত্রপতি শাসিত ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা: এ ব্যাপারে জানার জন্য কুরআনই বড় উৎস। সে বর্ণনা অনুযায়ী জাহেলী যুগের আরবরা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য মনগড়া উপাস্য সমূহ নির্ধারণ করেছিল (ইউনুস ১০/১৮)। তারা আল্লাহকে স্বীকার করত। সেই সাথে সুফারিশকারী হিসাবে অন্যদের উপাস্য মানত (আন'আম ৬/১৯)। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তারা মূর্তিগুলিকে তাদের পূজিত ব্যক্তিদের 'রূহের অবতরণ স্থল সমূহ' বলে মনে করত। মূর্তিপূজা তাদের আক্বীদা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছিল। যুগ পরম্পরায় তারা এই আক্বীদায় বিশ্বাসী ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল (যুখরুফ ৪৩/২২)।

তারা কা'বা গৃহে মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহে পরিবর্তন এনেছিল। তাওয়াফের জন্য 'হারামের পোষাক' নামে তারা নতুন পোষাক পরিধানের রীতি চালু করেছিল। নইলে লোকদের নগ্ন হয়ে তাওয়াফ করতে হ'ত।

কুরায়েশরা মূর্তিপূজা করত। সেই সাথে নিজেদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর একান্ত অনুসারী হিসাবে 'হানীফ' 'একনিষ্ঠ একত্ববাদী' বলত। এছাড়া তারা নিজেদেরকে 'হুম্স', 'ক্বাত্বীনুল্লাহ' 'আহ্লুল্লাহ' এবং 'আল্লাহ্র ঘরের বাসিন্দা' বলে দাবী করত'। সেকারণ তারা মুযদালিফায় হজ্জ করত, আরাফাতের ময়দানে নয়। কেননা মুযদালিফা ছিল হারামের অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাত ছিল হারাম এলাকার বাইরে। যেখানে বহিরাগত হাজীরা অবস্থান করত। ইসলাম আসার পর এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সকলকে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে বলা হয় (বাক্বারাহ ২/১৯৯)।

তারা হজ্জের মাস সমূহে ওমরাহ করাকে 'সবচাইতে নিকৃষ্ট কাজ' বলে ধারণা করত। তারা কা'বাগৃহে ইবাদতের সময় শিস দিত ও তালি বাজাতো (আনফাল ৮/৩৫)।

তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে পরিবর্তন এনেছিল (আ'রাফ ৭/১৮০)। তারা জিনদেরকে আল্লাহ্র শরীক নির্ধারণ করেছিল (আন'আম ৬/১০০) এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলত (নাহল ১৬/৫৭)। তারা তাকদীরকে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করত (আন'আম ৬/১৪৮; নাহল ১৬/৩৮)। তারা ইবাদত করত, কুরবানী করত বা মানত করত আখেরাতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য।

তারা মৃত্যু ও অন্য বিপদাপদকে আল্লাহ্র দিকে নয় বরং প্রকৃতির দিকে সম্বন্ধ করত (জাছিয়াহ ৪৫/২৩)।

তারা মূর্তির সম্মানে কুরবানী চালু করেছিল (মায়েদাহ ৫/৩)।

লাত ও 'উযযার নামে কসম করত এবং নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করত' (বুখারী হা/৩৮৫০)।

আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতি ১৩ দিন পর একটি নক্ষত্র পশ্চিমে অস্ত যায় এবং একই সাথে পূর্ব দিকে একটি নক্ষত্র উদিত হয়। তাদের বিশ্বাস মতে উক্ত নক্ষত্র অস্ত যাওয়ার সময় অবশ্যই বৃষ্টি হয় অথবা ঠান্ডা হাওয়া প্রবাহিত হয়। সেকারণ বৃষ্টি হ'লে তারা উক্ত নক্ষত্রের দিকে সম্বন্ধ করে বলত, 'আমরা উক্ত নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি'। আল্লাহ্র হুকুমে যে বৃষ্টি হয় এটা তারা বিশ্বাস করত না।

এভাবে তারা তাওহীদ বিশ্বাস থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল। অথচ এটাই ছিল তাদের পিতা ইবরাহীমের মূল দাওয়াত। তাদের চরিত্রে ও রীতি-নীতিতে এমন বহু কিছু ছিল যা ইসলামকে ধসিয়ে দিত। যেমন

বংশগৌরব করা ও অন্য বংশকে তাচ্ছিল্য করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে চারটি বস্তু রয়েছে জাহেলিয়াতের অংশ, যা তারা ছাড়েনি। আভিজাত্য গৌরব, বংশের নামে তাচ্ছিল্য করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং শোক করা'।

জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল, পিতা-মাতার কাজের উপর বড়াই করা, মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে গর্ব করা (তওবা ৯/১৯, ৫৫)। ধনশালী ব্যক্তিদের সম্মানিত মনে করা (যুখরুফ ৪৩/৩১) এবং দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে হীন মনে করা (আন'আম ৬/৫২)।

যেকোন কাজে শুভাশুভ নির্ধারণ করা ও ভাগ্য গণনা করা (জিন ৭২/৬) ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে অনেক জাহেলী কবির মধ্যে তাওহীদের আক্বীদা ছিল। যেমন মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমা ও কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ প্রমুখ। কা'বাগৃহে হজ্জ জারী ছিল। হারামের মাসগুলির পবিত্রতা বজায় ছিল। অদৃষ্টবাদের আধিক্য থাকলেও তাদের মধ্যে ক্বাযা ও ক্বদরের আক্বীদা মওজুদ ছিল। ইবরাহীমী দ্বীনের শিক্ষা ও ইবাদতের কিছু নমুনা মক্কা ও তার আশপাশে জাগরুক ছিল। তাদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, আতিথেয়তা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলী অক্ষুণ্ন ছিল।

সামাজিক অবস্থা :

(ক) গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থা: আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল গোত্রপ্রধান। যার কারণে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হ'ত। মারামারি ও হানাহানিতে জর্জরিত উক্ত সমাজে কেবল গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই তাদের টিকে থাকতে হ'ত। ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ণীত হ'ত গোত্রীয় স্বার্থের নিরিখে। গোত্র সমূহের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেকারণ তারা অধিক সংখ্যায় পুত্র সন্তান কামনা করত। অধিক সংখ্যক ভাই ও পুত্র সন্তানের মালিককে সবাই সমীহ করত। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে অন্যান্য সম্পদের সাথে নারীদের লুট করে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা দরিদ্রতার কারণে অনেকে তাদের কন্যা সন্তানকে শিশুকালেই হত্যা করে ফেলত। তবে পূর্ব থেকে ধর্মীয় রীতি চলে আসার কারণে তারা বছরে চারটি সম্মানিত মাসে (যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব) যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো।তাদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুদ্ধ ও পেশীশক্তিই ছিল বিজয় লাভের মানদন্ড।

আরবের সামাজিক অবস্থাকে এক কথায় বলতে গেলে Might is Right তথা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে পরিচালিত হ'ত।

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা: ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। আর্থিক লেনদেনে সূদের প্রচলন ছিল। তারা চক্রবৃদ্ধি হাওে পরস্পরকে সূদভিত্তিক ঋণ দিত।

রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই ব্যবসায়ী কাফেলা লুট হ'ত। সেজন্য সশস্ত্র যোদ্ধাদল নিয়ে তারা রওয়ানা হ'ত।

তবে কা'বাগৃহের খাদেম হওয়ার সুবাদে মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা বিশেষভাবে সম্মানিত ছিল এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকত।

বছরের আট মাস লুটতরাজের ভয় থাকলেও হারামের চার মাসে তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করত।

এই সময় ওকায, যুল-মাজায, যুল-মাজান্নাহ প্রভৃতি বড় বড় বাজারে বাণিজ্যমেলা ছাড়াও আরবের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেকগুলি বড় বড় মেলা বসত।

এছাড়াও তারা শিল্প, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি নির্ভর ছিল।

(গ) নারীদের অবস্থা : তৎকালীন আরবে বিভিনড়ব শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মান-সম্মান অক্ষুণড়ব রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হ'ত। আরবীয় সমাজে স্বাধীনা ও দাসী দু'ধরনের নারী ছিল। স্বাধীনাগণ ছিলেন সম্মানিত। কিন্তু দাসীরা বাজার-ঘাটে বিক্রয় হ'ত। মনিবের দাসীবৃত্তিই ছিল তাদেও প্রধান কাজ।

(ঘ) নৈতিক অবস্থা: উদার মরুচারী আরবদের মধ্যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে দু'টি ধারা একত্রে পরিলক্ষিত হ'ত। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, মারামারি ও হানাহানি লেগে থাকত। অন্যদিকে তেমনি দয়া, উদারতা, সততা, পৌরুষ, সৎসাহস, ব্যক্তিত্ববোধ, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, দানশীলতা, আমানতদারী, মেহমানদারী, প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর সমাবেশ দেখা যেত। তাদের মধ্যে দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়া ভাবটা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী।